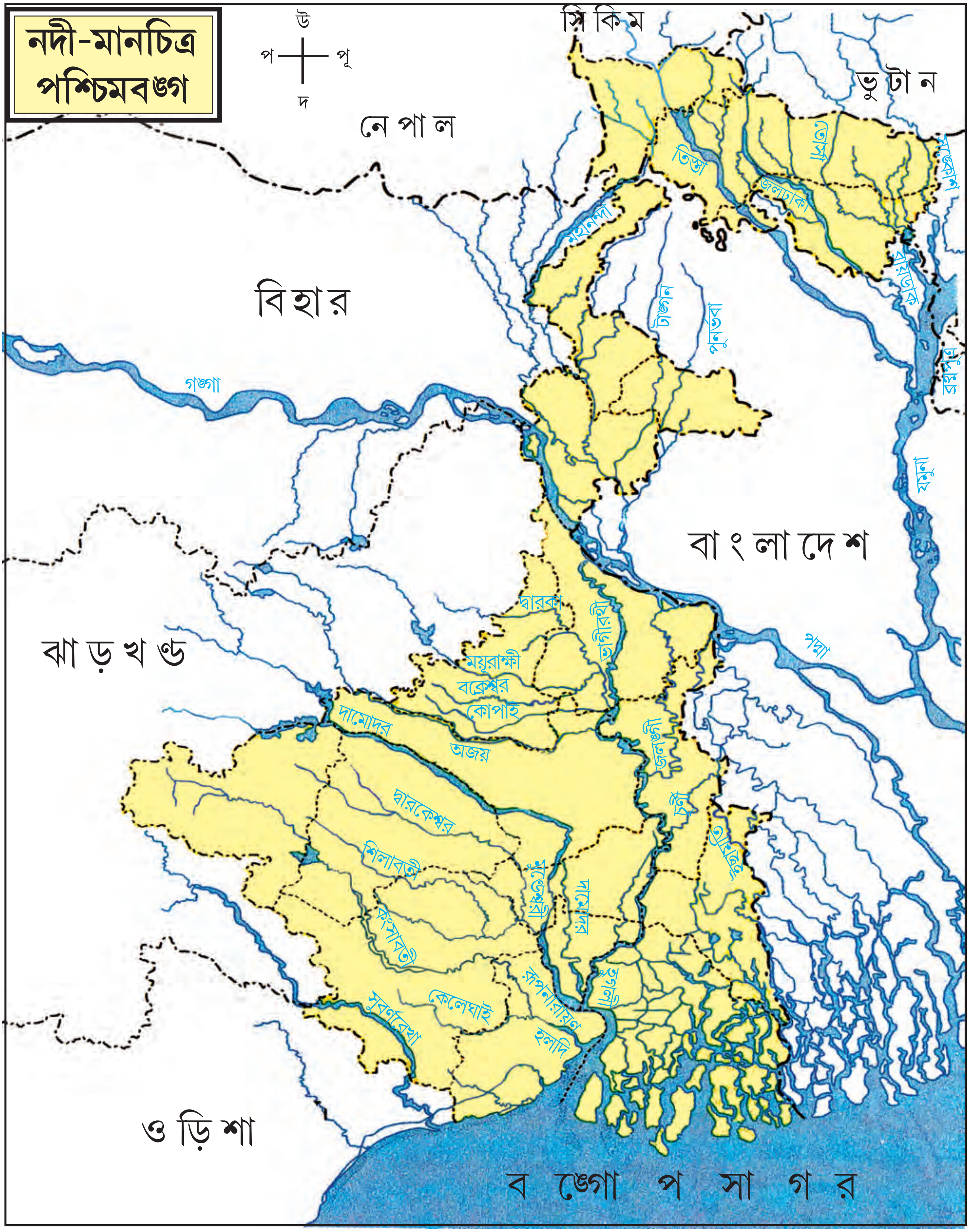
নদী-মানচিত্র
পশ্চিমবঙ্গ
উ
প
পূ
দ
সিকিম
ভুটান
নেপাল
বিহার
বাংলাদেশ
ঝাড়খণ্ড
ওড়িশা
বঙ্গোপসাগর
তিস্তা
তোর্সা
জলঢাকা
সংকোশ
রায়ডাক
মহানন্দা
টাঙ্গন
পুনর্ভবা
গঙ্গা
যমুনা
পদ্মা
দ্বারকা
ভাগীরথী
ময়ূরাক্ষী
বক্রেশ্বর
কোপাই
দামোদর
অজয়
জলঙ্গী
চূর্ণী
ইছামতী
দ্বারকেশ্বর
শিলাবতী
কংসাবতী
কেলেঘাই
সুবর্ণরেখা
রূপনারায়ণ
হলদি
দামোদর
হুগলী

জমির ঢাল বা ভূমির ঢাল

বৃষ্টি থামার পর অন্তরা বেরোলো। স্কুলে যাবে। পথে রফিকুলের সঙ্গে দেখা। হাঁটতে হাঁটতে ওরা কালভার্টের কাছে পৌঁছে গেল। কালভার্টেরউপর দুজন লোক বসে আছে। তলার পাইপ দিয়ে জল যাচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণের মাঠে। সেটা দেখিয়ে রফিকুল বলল— দেখ, দক্ষিণের মাঠটা উত্তরের মাঠটার চেয়ে নীচু। উত্তরের সব জলই যাচ্ছে দক্ষিণে। তার মানে জমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে। অন্তরার বেশ মজা লাগল। স্কুলে গিয়ে সে এসব বলল। স্যার বললেন— সবাই নিজেরা দেখবে। এখানকার জমির ঢাল বা ভূমির ঢাল বুঝতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের নদী-মানচিত্রটা দেখছিল আকাশ। সে বলল— নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে আসছে। তাহলে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢাল। এ তো বোঝাই যাচ্ছে!

অশেষ বলল— দামোদর পশ্চিম থেকে পূর্বে এসেছে। তারপর দক্ষিণে গিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। তাই না স্যার?

— তবে যেখানে দামোদর মিশেছে সেখানে ওই নদীর নামটা হুগলি নদী। অনেকেই অবশ্য গঙ্গা বলেন।

অন্তরাও নদী-মানচিত্রটা দেখছিল। সে বলল--- নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে গেছে। তাহলে ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে আর পশ্চিম থেকে পূর্বে।

মানচিত্রে উঁচু জায়গা, নীচু জায়গা

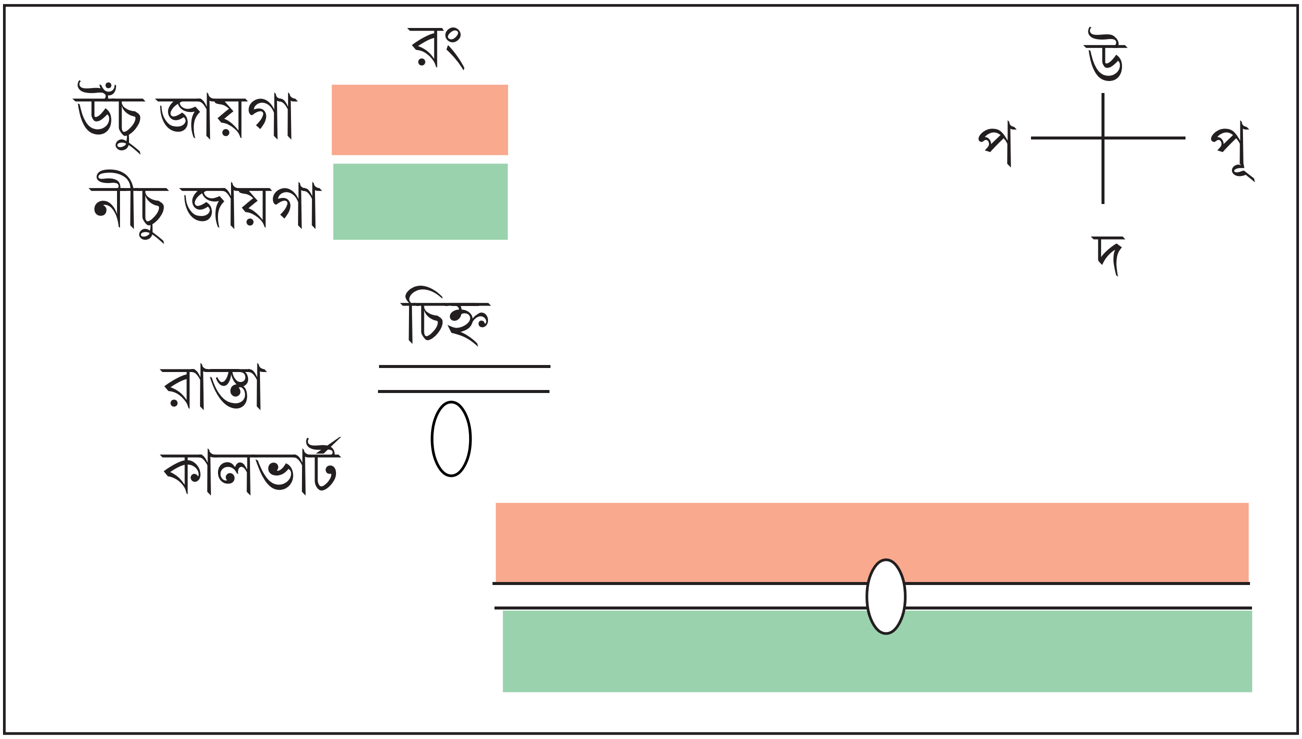

রফিকুল বলল - স্যার, মানচিত্রে চিহ্ন দিয়ে ভূমির ঢাল বোঝানো যায়?

— ভেবে দেখো। এক দিকটা উঁচু। আর একটা দিক নীচু। এটা দেখাতে হবে। নানারকম রং ব্যবহার করলে কি সুবিধা হতে পারে?

অন্তরা বলল— হ্যাঁ স্যার। উঁচু জায়গা একটা রঙে দেখাব। নীচু জায়গা অন্য রঙে দেখাব।

— বেশ। আজ তোমার চেনা জায়গার ঢাল জেনেছ। সেটার উঁচু-নীচু বোঝানোর মানচিত্র এঁকে দেখাও।

অন্তরা দু-দিকের মাঠের ভূমির ঢাল বুঝিয়ে মানচিত্র এঁকে দিল।

দেখেশুনে লেখো

কাছাকাছি অঞ্চলের ভূমির ঢাল দেখে একটা ছবি এঁকে কোন দিক থেকে কোন দিকে ঢাল বুঝিয়ে দাও:

তোমার ঠিকানা	দেখার তারিখ	কোথায় দেখেছ	কোন দিক থেকে কোন দিকে ঢাল	ভূমির ঢাল বোঝানোর মানচিত্র
				উঁচু জায়গা নীচু জায়গা উ প — পূ দ

পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল

বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনে মালতি অনেকবার গেছে। সেখানে তার মামার বাড়ি। মালতি বলল— ওখানে ভূমি সবজায়গায় সমতল নয়। ঢেউ খেলানো ভূমির মাঝে মাঝে উঁচু টিলা আর পাহাড় দেখা যায়।

অন্তরা বলল— আর যেখানে পাহাড় নেই সেখানকার মাটি?

--- বেশিটাই কাঁকর, পাথর মেশানো লালমাটি। অনুর্বর।

স্যার এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন— এটাকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল বলে। পুরুলিয়ার পুরোটাই এইরকম। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম আর বর্ধমানের পশ্চিম দিকটাও তাই। মানচিত্র দেখো। বুঝতে পারবে। এখানকার মাটি লালচে।

রহমান বাঁকুড়ায় গেছে। সে বলল— বাঁকুড়ার চারিদিকে শালগাছের জঙ্গল। সেই শালপাতা দিয়ে প্লেট, বাটি বানানো হয়।

মালতি বলল— অন্য গাছও আছে। মেহগনি, পলাশ, পিয়াল, ইউক্যালিপ্টাস, সোনাঝুরি, কেন্দু।

পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কেমন মাটি ও কত উঁচু ভূমি

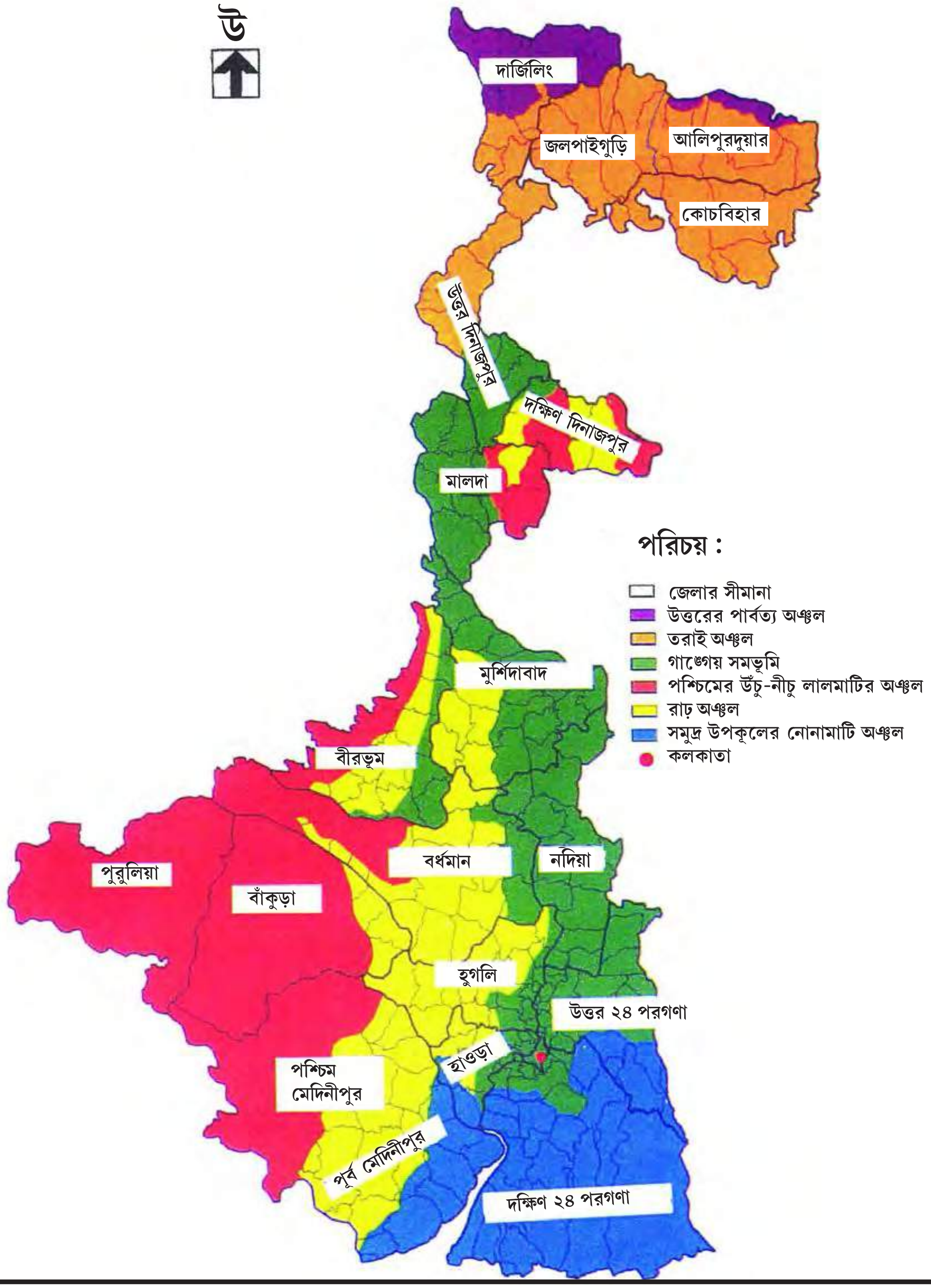

বলাবলি করে লেখো

ফলের গাছ নয়, বনের গাছ। কী কী দেখেছ?

তা নিয়ে নীচে লেখো :

মেহগনি, পলাশ, মহুয়া, গামার, শিশু, আকাশমণি— এর মধ্যে কী কী গাছ দেখেছ? নাম লেখো। পাতার ছবি আঁকো।	আমরা ফল খাই না, এমন গাছ আর কী কী দেখেছ? নাম লেখো। পাতার ছবি আঁকো।

রাঢ় অঞ্চল

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে রফিকুলের আত্মীয়ের বাড়ি। সে বলল— বাঁকুড়ার পূর্ব আর দক্ষিণ দিকে কিন্তু জমি বেশ উর্বর।

— বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে বয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর নদ। পরে সেটা দক্ষিণ দিকে বেঁকে হুগলি জেলায় ঢুকেছে। আর দ্বারকেশ্বরের দক্ষিণে শিলাবতী

নদী দক্ষিণ-পূর্বে গেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের কাছে তারা মিলেছে। নাম হয়েছে রূপনারায়ণ। ওই অঞ্চলের কিছু অংশেও এই ধরনের উর্বর জমি।

অন্তরা অনেকবার দুর্গাপুরে গেছে। সে বলল— বর্ধমানের পূর্বদিকটাও তো উর্বর সমভূমি!

— হ্যাঁ। দামোদর তখন সমভূমিতে। হুগলির কাছাকাছি দামোদর থেকে বেরিয়েছে মুণ্ডেশ্বরী। মানচিত্রটা দেখো।

আবিদ বলল - একটু পশ্চিম ঘেঁসে দক্ষিণে গিয়ে মুণ্ডেশ্বরী মিশেছে রূপনারায়ণে। দামোদর হাওড়া জেলার ভিতর দিয়ে দক্ষিণে গেছে। মিশেছে হুগলি নদীতে। রূপনারায়ণও গেঁওখালিতে মিশেছে হুগলি নদীতে।

— ঠিক বলেছ। এর একটু পশ্চিম দিয়ে দক্ষিণে গেছে কেলেঘাই আর কংসাবতী নদী। এরা মিশে তৈরি হয়েছে হলদি নদী। সেটা হলদিয়াতে গিয়ে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশেছে।

বরুণ একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। সে বলল— বীরভূমের পূর্বদিকটাও তো একইরকম।

স্যার বললেন— ওখানে রয়েছে ময়ূরাক্ষী নদী আর অজয় নদ। মানচিত্র দেখো। বুঝতে পারবে।

— এই নদীগুলো বর্ষার সময় পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের জল বয়ে আনে। তারপর সমতলে বন্যা হয়।

— এই অঞ্চলটাকে বলে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল। সব জায়গায় উর্বর মাটি। বেশিটা দোঁআশ। কিছুটা এঁটেল। ভূমি প্রায় পুরোটা সমতল। উত্তর আর পশ্চিম ধার বরাবর ভূমি ক্রমশ উঁচু হয়েছে। সেদিকে মাটি লালচে, ভূমি কিছুটা ঢেউ খেলানো। যত পূর্বে আর দক্ষিণে যাবে তত সাধারণ মেটে রং-এর মাটি দেখতে পাবে।

— রাঢ় অঞ্চলের বনজঙ্গল?

স্যার হেসে বললেন— সেসব কেটে চাষ-আবাদ করা হয়ে গেছে আগেই। তবে গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে। শাল, সেগুন, শিশু, মেহগনি,

শিরীষ, আকাশমণি, কদম, বাবলা — বনের নানারকম গাছ। নানা জায়গায় রাজ্যের বন-দফতর গাছ লাগিয়েছে। এভাবে কয়েকটা নতুন বন তৈরি হয়েছে। ওদিকে গেলে রাস্তার ধারে ধারে দেখতে পাবে।

বলাবলি করে লেখো

তুমি যেখানে থাকো সেখানকার ভূমির ধরণ, মাটি, বন, নদী কেমন? নীচে লেখো:

সেখানকার ভূমির ধরণ কেমন — মালভূমি, সমভূমি না পার্বত্য ?	
নদী আছে কিনা, থাকলে কোন নদী, সারাবছর জল থাকে কিনা ?	
সেখানকার ভূমির ঢাল কী ধরনের? কম না বেশি?	
সেখানকার মাটির রং কী ?	
বন আছে কিনা, থাকলে তাতে কী গাছ আছে, নতুনভাবে কী কী গাছ লাগানো হয়েছে ?	
সেখানে চাষবাস হয় কিনা — হলে কী কী ফসল ফলে?	

বরফ-গলা জলের নদী

ঈশানের মামাবাড়ি নদিয়া জেলায়। সেখানে অনেক নদী। গঙ্গা খুব চওড়া। তাছাড়া জলঙ্গী, মাথাভাঙা, চূর্ণি, ইছামতিও রয়েছে।

মামা বলেছিলেন — গঙ্গা হলো নিত্যবহ নদী। অর্থাৎ সবসময় বয়ে যায়। সারাবছর জল থাকে।

একথা শুনে স্যার বললেন — পর্বতের মাথায় জমা বরফ গলে গঙ্গার জল আসে।

ঈশান বলল— পর্বতের মাথায় বরফ জমে কেন?

—পুকুর-নদী-সমুদ্রের জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায়। ওপরের বাতাস ঠান্ডা। তাই সেই বাষ্প জমে জল হয়। পর্বতের মাথায় ঠান্ডা বেশি বলে তুষারপাত হয়, তুষার জমে বরফ হয়ে যায়। সূর্যের তাপে কিছুটা বরফ গলে। জল হয়ে খাড়া পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসে। এইরকম অনেকগুলো ছোটো ছোটো জলধারা

মিশে বড়ো নিত্যবহ নদী তৈরি করে। জলপাইগুড়ি জেলায় তিস্তাকে যেমন দেখায়।

— এভাবেই কি গঙ্গাও তৈরি হয়েছে?

— এভাবেই হয়েছে। তবে গঙ্গা অনেক দূর থেকে আসছে। উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা থেকে এর শুরু। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মধ্যে দিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ঢুকেছে। তারপর দুটো ভাগ হয়ে গেছে। বেশি চওড়া ধারাটা চলে গেছে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে। তার নাম পদ্মা। আর অন্য

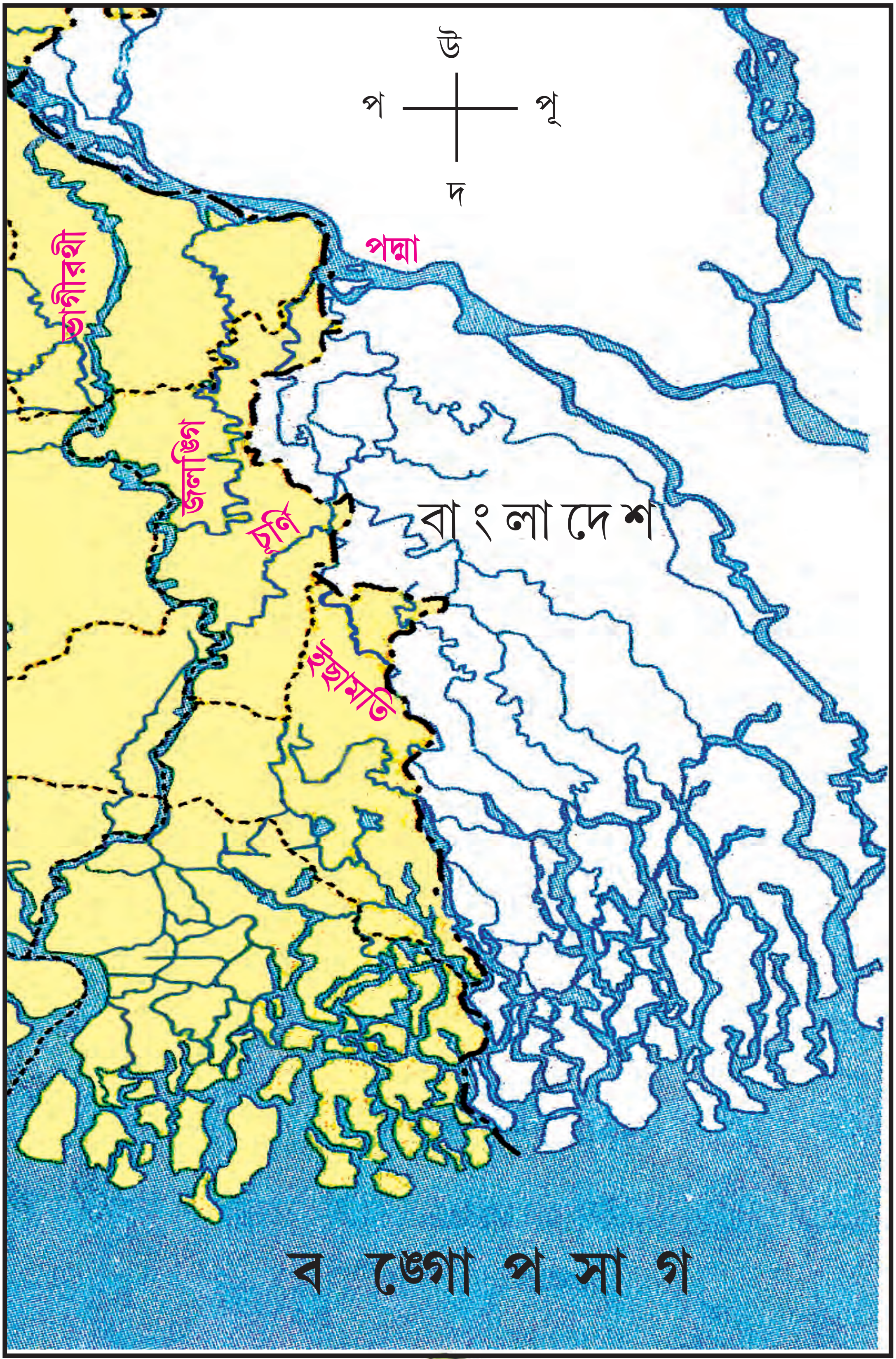
উ
প
পূ
দ
পদ্মা
ভাগীরথী
জলঙ্গি
চূর্ণি
ইছামতি
বাংলাদেশ
বঙ্গোপসাগর

ধারা পশ্চিমবঙ্গের ভেতর দিয়ে গেছে। এই ধারাটার নাম ভাগীরথী। হুগলি জেলায় এর নাম হুগলি নদী। শেষে ডায়মন্ডহারবার, হলদিয়া পেরিয়ে আরও দক্ষিণে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

দেখে বুঝে লেখো

নদী-মানচিত্র দেখে নদীগুলোর সম্পর্কে লেখো:

নদীর নাম	কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় মিশেছে
চূর্ণি	
জলঙ্গী	
ইছামতি	

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

অন্তরা বলল--- কম চওড়াটাই আমাদের গঙ্গা? তাহলে পদ্মাটা কত চওড়া?

--- কোনো কোনো জায়গায় মাঝনদী থেকে পাড় দেখা যায় না। মনে হয় সমুদ্রের কূল নেই।

রফিকুল বলল --- ভাগীরথী আর পদ্মার মাঝে অনেকটা জায়গা!

— দুই নদীর পলি জমেই মাঝখানের ভূখন্ডটা তৈরি হয়েছে। এটাকে বলে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ।

রিনা বলল - ওখানকার মাটি খুব উর্বর?

—একেবারে দক্ষিণে সুন্দরবনের নোনা মাটি। বাকিটা সুজলা সুফলা শস্য - শ্যামলা। সমতল আর সমতল।

শেষই হয় না। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি কোথায় ছিল জানো তো?

— কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। গঙ্গার খুব কাছেই।

--- হ্যাঁ, আবার পদ্মার গায়ে একটা জায়গার নাম শিলাইদহ। সেখানে তাঁর বাবার জমিদারি ছিল। তাঁকে সেই জমিদারি দেখার ভার দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তাই কলকাতা থেকে শিলাইদহ যাওয়া-আসা করতেন তিনি। সম্ভবত এই অঞ্চল দেখেই তিনি মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা বলে একটা বিখ্যাত গান লিখেছিলেন।

অনেকে মিলে বলে উঠল— গানটা জানি,স্যার। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

--—গানটা ১৯০৫ সালে লেখা। ইংরেজরা বাংলাকে দু-ভাগ করে দিয়েছিল। দুটো আলাদা প্রদেশ। সেই ঘটনাকে বলে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ।

অরুণ বলল — স্যার ইংরেজরা বাংলাকে দু-ভাগ করেছিল কেন?

— ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শাসন করত। ভারতবর্ষের লোকেরা ইংরেজদের এই শাসন মেনে নেয়নি। তারা চাইত দেশের লোকেই দেশ চালাবে। তাই দেশের মানুষ একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ইংরেজরা চেয়েছিল একজোট হওয়া মানুষকে আলাদা করতে। বাংলাকে দু-ভাগ করে দিয়ে সেই ভাগাভাগি শুরু করতে চেয়েছিল ইংরেজ শাসকরা। বাংলার মানুষ এই ভাগাভাগি মেনে নেয়নি। সবাই মিলে প্রতিবাদ করে। বিদেশি জিনিসপত্র ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয় লোকেরা। চরকা কেটে সুতো বানিয়ে সেই থেকে নিজেরা কাপড়-জামা বানায়। রবীন্দ্রনাথও বাংলাভাগের বিরোধিতা করেন। তার প্রতিবাদে এই গানটা তিনি লিখেছিলেন। এখন আবার ওই গানটা খুব বিখ্যাত। কেন বলত?

সবাই মিলে বলল— ওটা তো বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত!

--- গাছ,লতা, ফুল,ফল আর হরেক ফসলের এই সমভূমি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে এই ব-দ্বীপের পশ্চিম অংশটা পশ্চিমবঙ্গে। রংবেরঙের প্রজাপতি, পাখি, মৌমাছি আর গাছপালার সঙ্গে গাঁথা এখানকার মানুষের জীবন।

নদীতীরের সভ্যতা

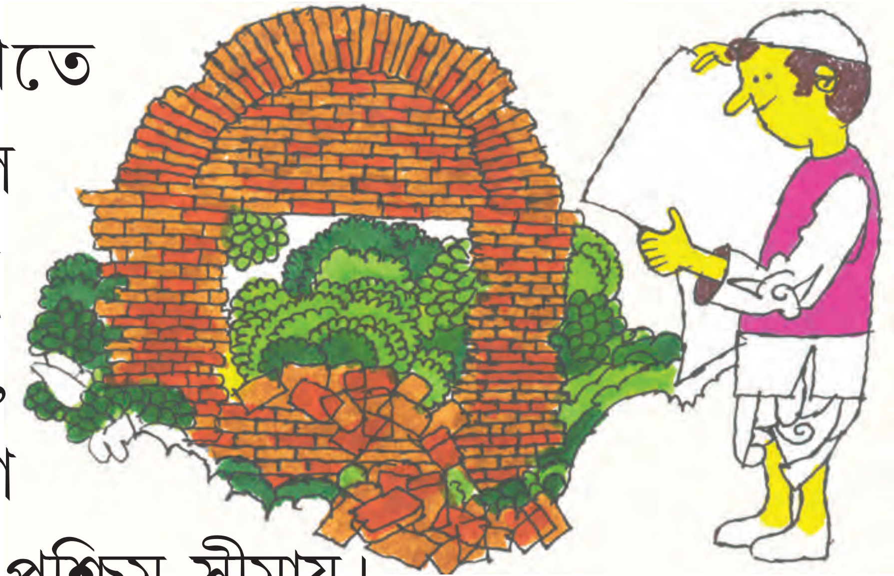

মানচিত্র দেখতে দেখতে রফিকুল বলল --- কিন্তু গঙ্গা তো নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পশ্চিম সীমায়। ইছামতি পূর্ব সীমার কাছে। মাঝে তো নদী নেই। এই ভূমি এত উর্বর হলো কীভাবে?

স্যার বললেন— আগে নদী ছিল। বিদ্যাধরী, সূতি, যমুনা, নোয়াই। বিদ্যাধরী এখনও আছে। তবে এখন তা ছোটো নদী। অন্যগুলো আর নেই। বিদ্যাধরীর কাছে এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে অনেক কাল আগের ঘরবাড়ি, বাসনপত্র পাওয়া গেছে।

রঞ্জন বলল— জানি, চন্দ্রকেতু রাজার দুর্গ ছিল। ওখানকার লোকজন গড় বলে। কী পাতলা পাতলা ইট। পরপর তিনটে বসালেও এখনকার দুটোর মতো পুরু হবে না!

—হ্যাঁ, তখন সেখানে অনেক বড়ো কোনো নদী ছিল। পুরোনো দিনের কিছু কিছু শহর আজও দেখা যায়। সেইসব শহরে মানুষ ইটের বাড়ি বানাত। যেমন, হরপ্পা সভ্যতার বাড়িঘর। সেগুলো পোড়া ইট দিয়েই বানানো হয়েছিল। আগুনে পোড়া ইট। ঘর-বাড়ি ছাড়াও পথঘাট বানাত ইট দিয়ে। নর্দমাগুলোও ইটের হতো। জল ধরে রাখার বড়ো বড়ো চৌবাচ্চাও ইটের তৈরি হতো। জানো, সেই পুরোনো যুগে নদীর

ধারেই সভ্যতা গড়ে উঠত। নদী ছিল তাদের মায়ের মতো। তাই ওইসব সভ্যতাকে **নদীমাতৃক সভ্যতা** বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব পুরোনো সভ্যতাই নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল। তবে নদীর বন্যায় অনেক সময়ে সেখানকার বাসিন্দাদের ক্ষতিও হতো। তবুও, নদীর ওপর নির্ভর করেই মানুষ বেঁচে থাকত।

রুবি বলল — স্যার সভ্যতা মানে কী?

— সভ্য মানুষের নানান কাজকর্মকে একসঙ্গে বলে সভ্যতা। ধরো, একসময়ে মানুষ আজকের মতো অনেক কিছু পারত না। পোশাক পরতে জানত না। নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারত না। থাকার জন্য বাড়ি-ঘর বানাতে পারত না। পড়ালেখা জানত না। টাকা-পয়সার লেনদেন ছিল না। সহজে যাতায়াত করতে পারত না। তারপরে অনেক সময় ধরে এর সবগুলোই মানুষ শিখেছে। সেই শেখার ধাপগুলো একটু একটু করে সভ্য হওয়ার ধাপ। সেইসব ধাপ পার করে মানুষ আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

— কিন্তু স্যার, এই অঞ্চলে বন নেই?

— উত্তর চব্বিশ পরগনার পারমাদানে একটা পুরোনো বনখণ্ড আছে। আর নতুনভাবে তৈরি করা বন আছে নদিয়ার বেথুয়াডহরিতে। সেখানে শাল, সেগুন, মেহগনি, শিশু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কদম গাছ আছে। অনেক হরিণ, কাঠবিড়ালি আছে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার কাছাকাছি কোথায় পুরোনো সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে? সেখানকার কথা লেখো। নিজের জানা না থাকলে বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনে লেখো:

জায়গার নাম	কী কী পাওয়া গেছে (পোড়ামাটি /ধাতু/ অন্যান্য কোন জিনিস), ছবি আঁকো

সুন্দরবন

অন্তরা বলল— এদিকে বড়ো কোনো পুরোনো জঙ্গল নেই?

স্যার বললেন— আছে তো। গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণ অংশটাই বিরাট বন। সুন্দরবন। অবশ্য তার বেশির ভাগটাই বাংলাদেশে। উত্তর-চব্বিশ পরগনার অল্প কিছু অংশ আর দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের প্রায় পুরোটা জুড়ে সুন্দরবন। এই অঞ্চলের ভূমির ঢাল খুবই কম।

অন্তরা বলল— রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তো এই বনেই আছে?

এই অঞ্চলে আবিরের মাসির বাড়ি। সে বলল— আছে তো। ওই বাঘ আর সুন্দরী গাছ। এই বনের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাণী আর উদ্ভিদ। এটা খুব নীচু জায়গা। শুধু নদী আর নদী। মাতলা, বিদ্যাধরী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল। চলাফেরা করতে গেলে বারবার নৌকা চড়তে হয়।

— এখানে আরও অনেক নদী আছে। একটা নদী থেকে আর একটা বেরিয়েছে। কিছু দূরে গিয়ে আবার একটায় মিশেছে।

রফিকুল বলল— তবে শেষপর্যন্ত সব নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

অন্তরা বলল — এখানকার মাটিতে খুব নুন। মাটিতে বালি কম, কাদার ভাগ বেশি। মাটির তলার জলও নোনতা।

— তার কারণও সমুদ্র। এখানকার মাটির নীচের জলের স্তরের সঙ্গে সমুদ্রের সরাসরি যোগ রয়েছে যে! বনের

পুরোটাই সাগরের খুব কাছে। অনেক দ্বীপ রয়েছে। মানচিত্র দেখলেই ভালো বুঝতে পারবে।

সবাই মানচিত্রটা ভালো করে দেখতে লাগল। স্যার আবার বললেন— পশ্চিমবঙ্গের অংশটায় ১০২টি দ্বীপ আছে। তার মধ্যে আটচল্লিশটায় ঘন বন রয়েছে। বসতি নেই। চুয়ান্নটায় মানুষ বেশ কিছু বন কেটে বসতি করেছে।

ঈশান বলল— কীভাবে সাগরের মধ্যে এত বড়ো বন হলো?

—প্রচুর পলিমাটি গোলা জল ভাগিরথী, পদ্মা ও অন্যান্য নদী দিয়ে বয়ে যেত। এই অঞ্চলে ভূমির ঢাল কম। তাই সেই পলি জমে জমে দ্বীপ তৈরি হয়ে যায়। তারপর বন। এভাবে সাত-আট হাজার বছর ধরে এই বন গড়ে উঠেছে। নদীর জল আর সমুদ্রের জল মিশে আছে এই অঞ্চলে। ওই ঈষৎ নোনা জল আর কাদায় জন্মায় একধরনের গাছ। তাদের দু-রকম

মূল। মাটির গভীরে যায় ঠেসমূল। তা গাছকে মাটিতে আটকে রাখে। আর একরকম মূল মাটি থেকে উপরে ওঠে। তার সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয় গাছ। তাকে বলে শ্বাসমূল। এই ধরনের গাছকে বলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ।।

আবির বলল— এখানে গেঁওয়া, বাইন আর গরান গাছ আছে।

— ঠিক বলেছ, ওগুলোই ম্যানগ্রোভ গাছ। এছাড়া আছে হেতাল, গোলপাতা। এখানকার জলে কামট আছে, খুব লম্বা খাঁড়ির কুমির আছে। ডাঙায় মেঠো বিড়াল, বুনোশুয়োর, চিতল হরিণ আছে। এখানে একশো বছর আগেও চিতাবাঘ, জাভান গন্ডার, বুনো মহিষ, বারশিঙ্গা পাওয়া যেত।

— এখানকার লোক নানারকম কাজ করেন। চাষ, মধু সংগ্রহ। নৌকা তৈরি করা ও চালানো। মাছ ও মীন ধরা, কাঁকড়া শিকার।

ফতেমা বলল— দিদি, ওই মীন থেকেই তো ভেড়িতে গলদা চিংড়ি আর বাগদা চিংড়ির চাষ হয়। মেয়েরাই বেশিরভাগ নদীতে নেমে মীন সংগ্রহ করেন।

বলাবলি করে লেখো

সুন্দরবন সম্পর্কে বাড়িতে, পাড়ায় ও স্কুলে বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর লেখো :

সুন্দরবনে ঝড়ের সমস্যা কেমন	সুন্দরবনে যাতায়াত কীভাবে হয়	বাঘ না থাকলে সুন্দরবনের কী হতো

কোথায় উঁচু, কোথায় নীচু

স্কুল থেকে ফেরার সময় রফিকুল ভাবল সুন্দরবনটা তাহলে সবচেয়ে নীচু জায়গা। তারপর গাঙ্গেয় সমভূমিটা। তারপর রাঢ় অঞ্চলটা। পশ্চিমের মালভূমিটা সবচেয়ে উঁচু। কিন্তু কতটা উঁচু? কোন লেভেল থেকে মাপা যায়? পরদিন ক্লাসে এসব জানতে চাইল।

স্যার বললেন— সমুদ্রের জলের তল থেকে উচ্চতা মাপতে হয়। তোমরা সবাই এক মিটারের চেয়ে একটু বেশি লম্বা। তাহলে সুন্দরবন সমুদ্রজলের তুলনায় কত উঁচু হতে পারে?

ঈশান বলল — ২-৩মিটার হবে।

— তুমি যেখানে গেছ, সেখানে তাই। তবে ৪-৫ মিটার উঁচু জায়গাও আছে। বেশিরভাগ জায়গার উচ্চতা কমবেশি ৩মিটার হতে পারে।

রেখা বলল--- গাঙ্গেয় সমভূমি আর একটু উঁচু। সমুদ্রজলের তুলনায় ১০-১৫ মিটার হবে?

— উত্তর ২৪ পরগনায় ৫-৬মিটার উচ্চতার জায়গা আছে। আবার মুর্শিদাবাদে ১৮-২০মিটার উচ্চতার জায়গা আছে। মোটামুটি এই অঞ্চল ১২-১৪মিটার উঁচু ভাবতে পারো।

এমিলি বলল--- রাঢ় অঞ্চল তো আরো উঁচু। ৫০-১০০মিটার হতে পারে?

— ঠিক বলেছ। তবে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের থেকেও বেশ উঁচু। ৫০মিটার থেকে ২০০মিটার উচ্চতায় বিভিন্ন জায়গা। বেশিরভাগ জায়গার উচ্চতা১০০-৫০০ মিটার ধরতে পারো।

— তাহলে সব অঞ্চলের উচ্চতাই আমরা জেনে নিলাম।

— সব বলা যাবে না। দক্ষিণবঙ্গের সব অঞ্চলের উচ্চতা জানা হলো। মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণের অংশটার কথাই আমরা বলেছি। এই অঞ্চলটাকে দক্ষিণবঙ্গ বলে।

বলাবলি করে লেখো

দক্ষিণবঙ্গের কোন পাঁচটা জেলা তোমার কাছাকাছি? সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সেই জেলাগুলোর সবচেয়ে উঁচু আর নীচু জায়গার উচ্চতা বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

তোমার ঠিকানা	কাছের জেলাগুলোর নাম	সবচেয়ে উঁচু জায়গার উচ্চতা	সবচেয়ে নীচু জায়গার উচ্চতা

উত্তরবঙ্গের উঁচু-নীচু জায়গা ও নদী

রফিকুল বলল— উত্তরবঙ্গে তো আরো উঁচু জায়গা আছে।

স্যার উত্তরবঙ্গের একটা মানচিত্র দেখালেন। বললেন— মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের নদীগুলো দেখো।

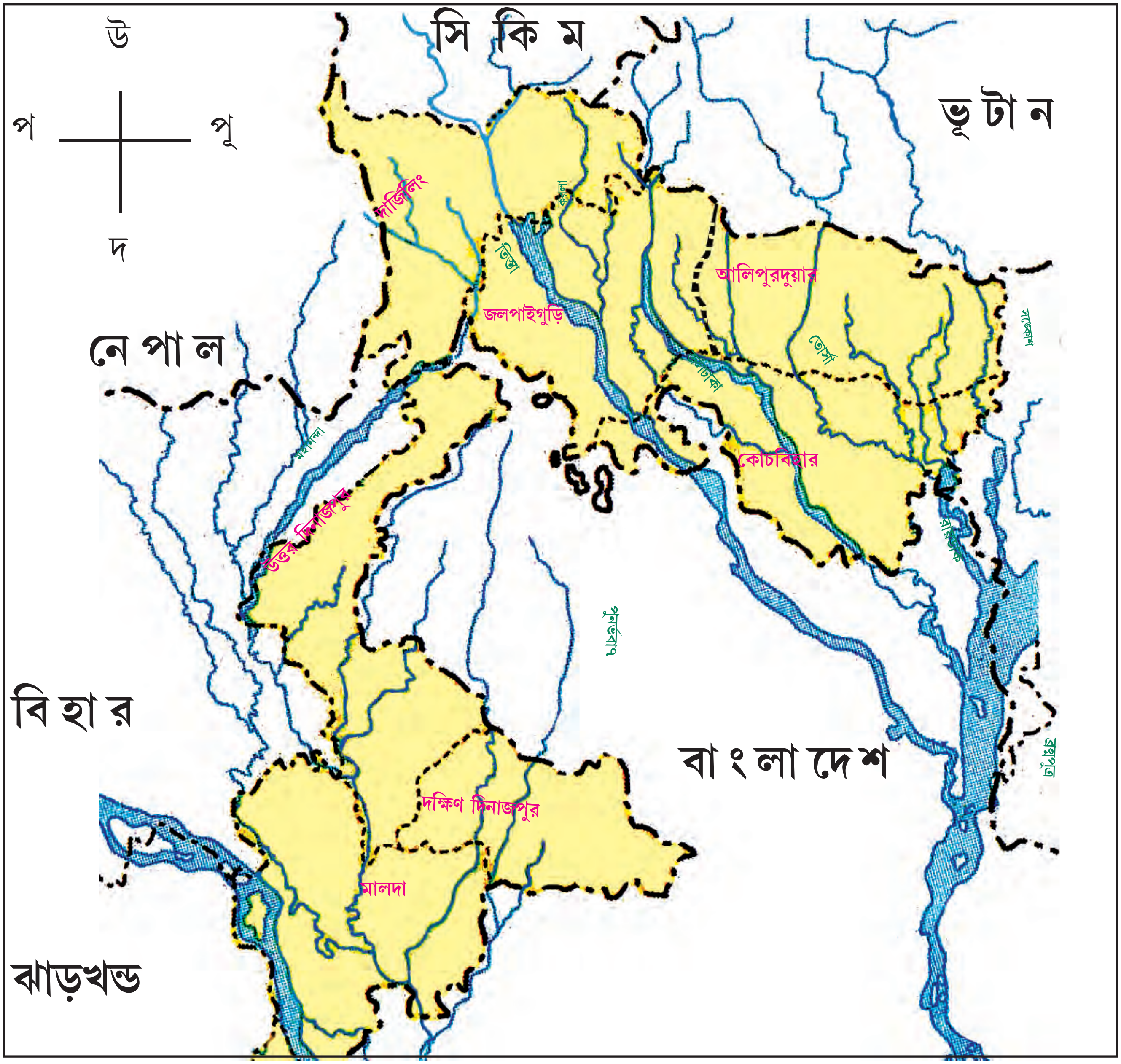

উত্তরবঙ্গের নদী-মানচিত্র

আকাশ বলল— উত্তর দিকটা হিমালয় পর্বতের অংশ।

— দার্জিলিং জেলার উত্তর দিকটা দেড় হাজার মিটারেরও বেশি উঁচু। জলপাইগুড়ির উত্তর দিকের উচ্চতা প্রায় এক হাজার মিটার।

রফিকুল মানচিত্রটা দেখছিল। সে বলল— তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, মহানন্দা, সঙ্কোশ — এগুলো বরফগলা জলের নদী?

আকাশ বলল— তা তো বটেই। খাড়া উপর থেকে জল নামছে। খুব স্রোত।

— নদীগুলো দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুর দুয়ার আর কোচবিহারের ঢালু জায়গা দিয়ে গেছে।

রফিকুল বলল— ঢালু জায়গাও আছে? পর্বতের পরই সমতল নয়?

--- পর্বতের পর কিছুটা ঢালু। তারপর সমতল। কোচবিহারের কিছু জায়গার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০-৪০মিটার। পুরো জায়গাটায় মাঝে মাঝে উঁচু-নীচুও আছে।

অন্তরা মানচিত্র দেখতে দেখতে বলল— এখানে আরো নদী আছে। কালজানি, রায়ডাক। এরাও পলি বয়ে আনে?

--- পলি আনে। তার সঙ্গে পাহাড় থেকে বালি, নুড়ি-পাথর আসে। তাই মাটিতে বালি, নুড়ি পাথর বেশি। মাটি স্যাঁতস্যাঁতে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির দক্ষিণ অংশ, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের উত্তর অংশের জমির এই বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চল তরাই অঞ্চল নামে পরিচিত।

বলাবলি করে লেখো

উত্তরবঙ্গে তোমার কাছের পাঁচটা জেলার নাম, ভূমি ও নদী বিষয়ে আলোচনা করে লেখো :

তোমার ঠিকানা	কাছের জেলাগুলোর নাম	জেলার ভূমি কেমন	ওই জেলায় কী কী নদী আছে

পর্বতশ্রেণি, পর্বতশৃঙ্গ

স্কুল থেকে ফেরার সময় আকাশ পর্বতশ্রেণির কথা বলল। পর্বতশ্রেণিগুলোয় উঁচু উঁচু পর্বতশৃঙ্গ থাকে। শৃঙ্গগুলো খুব খাড়া। উঁচু পর্বতশৃঙ্গগুলো সাদা হয়। কেন-না তার উপর বরফ জমে থাকে। শেষে বলল— দার্জিলিং-এ সিংগালিলা পর্বতশ্রেণি আছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ সান্দাকফু। তার উচ্চতা ৩৬৩০মিটার।

পরদিন ক্লাসে এসব শুনে অন্তরা বলল— ওখান থেকে কোনো নদী হয়নি?

স্যার বললেন— ওইসব জায়গা থেকে ছোটো বড়ো ঝরনা হয়ে বরফগলা জল গাড়িয়ে নীচে আসে। ওইরকম অনেক

ঝরনার জল মিলেই নদী হয়। অনেক সময় একাধিক জায়গা থেকে জল এসে একটা জায়গায় জমে। সেখান থেকে নদীর ধারাটা তৈরি হয়। আর সেটাকেই লোকে বলে নদীর জন্মস্থান। এমন একটা জায়গা দার্জিলিং জেলার ডাওহিল। সেখানে মহানন্দার জন্ম।

আকাশ বলল— দার্জিলিং যেতে গেলে তো পর্বতের বনের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। জলপাইগুড়িতে জলদাপাড়ায় বন আছে। সেখানে অনেক হাতি, একশৃঙ্গ গন্ডার আছে। এ অঞ্চলে আর কোথাও বন-জঙ্গল নেই?

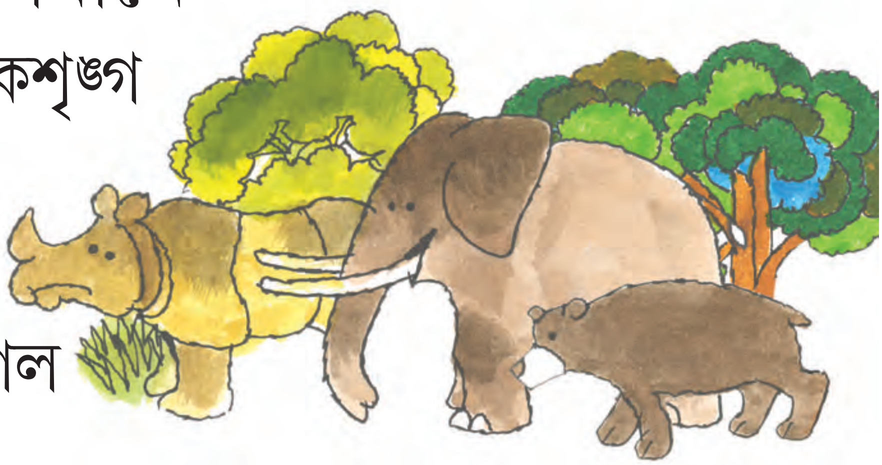

— ঠিকই বলেছ। পর্বতে ওঠার পথে সর্বত্রই কম-বেশি বন আছে। জলপাইগুড়ির উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই ঘন বন। সেখানেই আছে বক্সা-জয়ন্তি পাহাড়। আর বিখ্যাত বক্সার বাঘবন।

আয়ুব বলল— ওখানে বাঘ ছাড়া আর কোনো জন্তু নেই?

— হ্যাঁ। ভালুক, হাতি, হরিণ, অজগর, বাইসন আছে। নানারকম পাখি, নানা রঙের প্রজাপতিও দেখা যায়। এর মধ্যে শকুন সংরক্ষণ কেন্দ্রও আছে। এই জঙ্গলের এক দিকে ভুটান যাওয়ার রাস্তা। আর এক দিক দিয়ে যাওয়া যায় বাংলাদেশের রংপুরে। এখানে আছে বক্সা দুর্গ। একসময় এই দুর্গ ছিল ভুটানের। ১৮৬০-র দশকে ব্রিটিশরা এই দুর্গ দখল করেন। সেই থেকে এই দুর্গ ভারতের মধ্যে। পরে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতেন, তাঁদের অনেককে ব্রিটিশ সরকার এখানে বন্দি করে রাখত।

আকাশ বলল— এখান দিয়ে রেল লাইন গেছে।

— হ্যাঁ, জঙ্গলের বুক চিরে গেছে দীর্ঘ রেলপথ। শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার। পশুরা চলাফেরার পথে মাঝে মাঝে কাটা পড়ে রেলপথে।

— এখানে কী গাছ বেশি আছে?

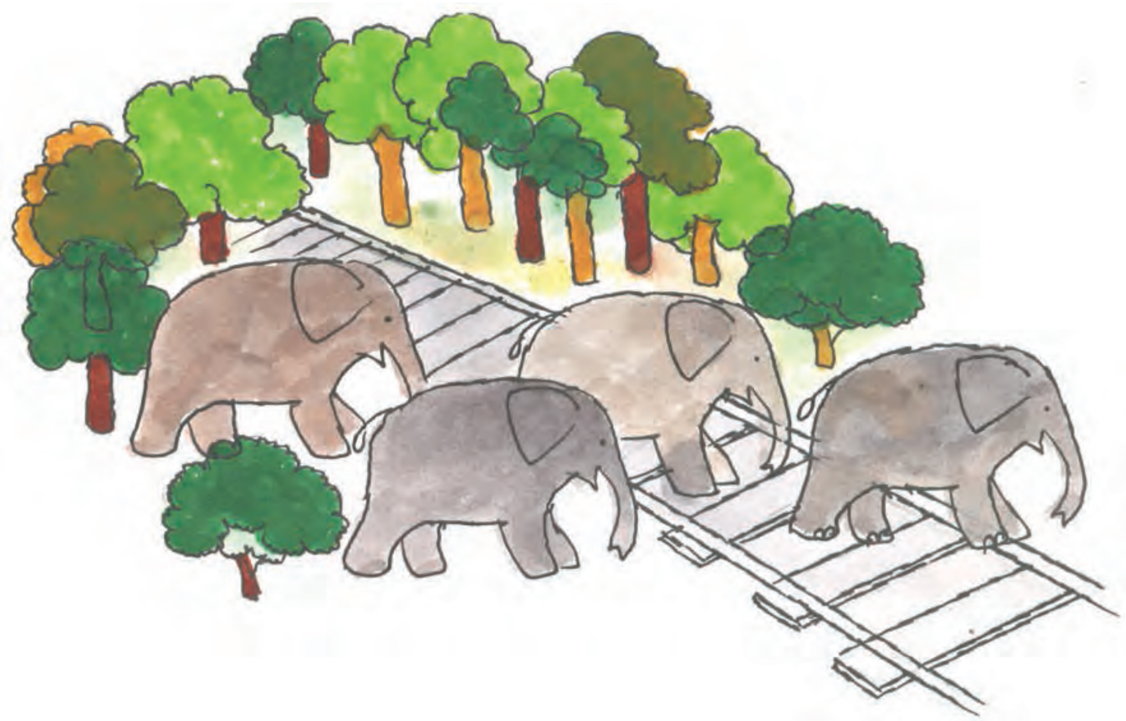

— এই জঙ্গলে নানা গাছ ও গুল্ম জন্মায়। সেগুন, শাল, চিলৌনি, পানিসাজ, খয়ের, শিশু, গামার গাছ খুব দেখা যায়। খুব বৃষ্টি হয়। স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকে বছরের অনেকটা সময়। সূর্যের আলো বিশেষ ঢোকে না।

মালতি বলল— জলপাইগুড়িতে আর একটা বন আছে গোরুমারায়। সেখানে কোন কোন বন্য জন্তু আছে?

— ওখানেও একশৃঙ্গ গন্ডার, চিতাবাঘ, ভালুক আছে। হাতি, বাইসন আছে। তাছাড়া ছোটো ছোটো অনেক পশু আছে।

বলাবলি করে লেখো

উত্তরবঙ্গের বনের পশু ও গাছপালার মধ্যে কী কী তোমার দেখা সে বিষয়ে লেখো, ছবি আঁকো :

কোন কোন গাছ দেখেছ	কোন কোন পশুপাখি দেখেছ	ওইসব গাছ, পশু-পাখির মধ্যে তোমার দেখা দু-একটার ছবি আঁকো

উত্তরবঙ্গের নানা জায়গা

নাসিমা বলল— স্যার, মালদাও তো উত্তরবঙ্গে ? মালদায় ফজলি আম হয়। এক একটার ওজন এক কেজিরও বেশি হয়।

স্যার বললেন— হ্যাঁ। এই অঞ্চল ফজলি আমের জন্যই বিখ্যাত।

রফিকুল মানচিত্র দেখছিল। বলল--- জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা। আর প্রায় মাঝখান দিয়ে গেছে মহানন্দা। এখানে কি সবটা সমভূমি?

--- মহানন্দার পুবদিকের ভূমি শক্ত, অনুর্বর। এই অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৪০-৫০মিটার। মহানন্দার পশ্চিম দিকটাকে দু-ভাগ করেছে কালিন্দী নদী। উত্তর পশ্চিমের অংশটা বেশি নীচু। বন্যা হয়। আর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটার ভূমি খুব উর্বর। এই অংশের উচ্চতা ১৫-২০মিটার।

অশেষ বলল— পুবদিকটা অনুর্বর। তাহলে ওই দিকটায় নিশ্চয়ই জঙ্গল আছে?

— আছে। তবে খুব ঘন জঙ্গল নয়। পিপুল, নিম, তেঁতুল, জাম, বাবলা, বাঁশ— এইসব গাছ আছে। ছোটো ছোটো বন্য পশুও আছে। এছাড়া রায়গঞ্জে কুলিক নদীর পাড়ে কুলিক পাখিরালয় আছে।

— দক্ষিণ দিনাজপুরের ভূমি কেমন?

—পশ্চিম দিকটা মালদা জেলার পুব দিকের লাগোয়া। এটা অনুর্বর, শক্ত অঞ্চল। উচ্চতা ৪০-৫০মিটার। তবে জেলার উত্তর অংশের ভূমি উর্বর। তার সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের ভূমির মিল আছে। ওই অঞ্চলের উচ্চতা ২৫-৩০মিটার।

বলাবলি করে লেখো

তোমার কাছাকাছি অঞ্চলের ভূমি, বন, নদীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন অঞ্চলের মিল তা লেখো :

মিলের বিষয়	তোমার বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য	যে অঞ্চলের সঙ্গে মিল তার নাম ও মিলের ধরন
ভূমির উচ্চতা		
ভূমির ধরন		
ভূমির উর্বরতা		
স্থানীয় নদী		
স্থানীয় বন		

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গের জেলা সদর

সবাই জানে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো শহর কলকাতা। রাজ্যের রাজধানী। এছাড়া আর বড়ো শহর কী কী? কোন শহরে কী আছে?

স্যার বললেন - তোমরাই বলো। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করো।

অনেকেই জেলা সদরগুলোর নাম জানে। মানচিত্রে বারবার দেখেছে। কোনটায় বিশেষ কী আছে তাও কিছু কিছু জানে। তারা যা বলল স্যার বোর্ডে তা লিখলেন। আরো কিছু কথা স্যার নিজেই লিখে দিলেন। তারপর বললেন – বাকিটার জন্য মানচিত্র দেখবে। নিজেরা আলোচনা করবে। বাড়িতে বা পাড়ায় যাঁরা জানেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলবে। তারপর লিখবে।

১৫০ ও ১৮৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখে, পড়ে ও আলোচনা করে ফাঁকা জায়গায় লেখো:

সদর শহর ও জেলার নাম	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
দার্জিলিং, দার্জিলিং জেলা			ম্যাল, চিড়িয়াখানা, রোপওয়ে, টয়ট্রেন, চা-বাগান, ঘুম, টাইগার হিল-এর জন্য বিখ্যাত। বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত দেখা যায়।
জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি জেলা			তিস্তা ও করলা নদীর তীরবর্তী শহর। জেলা হাসপাতাল, ফার্মেসি কলেজ আছে। সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জেলা			বক্সা অরণ্যের প্রবেশদ্বার। গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন। পর্যটনকেন্দ্র। ধান, চা, কাঠের বাণিজ্যকেন্দ্র।

সদর শহর ও জেলার নাম	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
কোচবিহার, কোচবিহার জেলা			তোর্সার পূর্ব তীরে অবস্থিত, পূর্বতন মহারাজের প্রাসাদ, মদনমোহন মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় জায়গা আছে।
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর জেলা			পাখিরালয় আছে।
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা			আত্রেয়ী নদীর পূর্বপাশে অবস্থিত। কলেজ, বিদ্যালয়, আইন কলেজ আছে। প্রান্তিক স্টেশন। বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি

সদর শহর ও জেলার নাম	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
ইংলিশ বাজার, মালদা জেলা			মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত আমের শহর। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পলিটেকনিক কলেজ আছে।
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা			ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। রেশম শিল্প, পিতলের বাসন তৈরির জন্য বিখ্যাত।
সিউড়ি, বীরভূম জেলা			তাঁত ও সিল্কের কাপড় তৈরি হয়, এখান থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত। সিউড়ির মোরব্বা বিখ্যাত।

সদর শহর ও জেলার নাম	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
কৃষ্ণনগর, নদিয়া জেলা			মাটির পুতুল ও সরপুরিয়া বিখ্যাত।
বর্ধমান, বর্ধমান জেলা			সীতাভোগ ও মিহিদানা বিখ্যাত।
বাঁকুড়া, বাঁকুড়া জেলা			টেরাকোটা শিল্পের জন্য বিখ্যাত।
পুরুলিয়া, পুরুলিয়া জেলা			কলেজ ও বিখ্যাত স্কুল আছে। এখানের ছৌনাচ বিখ্যাত। কাছেই অযোধ্যা পাহাড় রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি

সদর শহর ও জেলার নাম	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা			কংসাবতীর তীরে অবস্থিত।
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা			আদি নাম তাম্রলিপ্ত। একসময় রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল পান, ধান, কলা, ফুল ও ইলিশ মাছের বাণিজ্যকেন্দ্র। ডিগ্রি কলেজ আছে।
হাওড়া, হাওড়া জেলা			হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে।
চুঁচুড়া, হুগলি জেলা			হুগলি নদীর তীরে জি.টি. রোড-এর দু-পাশের শহর। নানা দর্শনীয় জায়গা আছে।

সদর শহর ও জেলার নাম	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা			বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র।
আলিপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা			চিড়িয়াখানা, জাতীয় পাঠাগার, টাঁকশাল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, আবহাওয়া অফিস আছে।
কলকাতা, কলকাতা জেলা			হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত রাজ্যের রাজধানী শহর। রাজভবন, মিউজিয়াম, ইডেন উদ্যান, ফোর্ট উইলিয়াম, পাতাল রেল, বন্দর, বিমানবন্দর আছে।

আরো শহর-নগরের কথা

পরের দিন। স্যার বললেন— ভালো করে ভাবো তো। আর কোনো শহরের নাম জানো কিনা।

আসলে তো আরও কয়েকটা শহরের নাম অনেকেই জানে। বিভিন্ন শহরে আত্মীয়রা থাকেন। তারা সেইসব শহরের নাম বলতে শুরু করল। অবশ্য অনেকেই একই শহরের নাম বলল। স্যার বললেন— এবারও আগের মতোই লেখা যাক। উত্তরবঙ্গের শহর থেকেই শুরু হোক।

১৮৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখে, পড়ে ও আলোচনা করে ফাঁকা জায়গায় লেখো:

শহরের নাম কোন জেলায়	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং জেলা			শহর, রেল স্টেশন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এই শহরে অবস্থিত। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ আছে।
কালিম্পং, দার্জিলিং জেলা			পাহাড়ি শহর। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। ফুল, ক্যাকটাস, অর্কিডের জন্য বিখ্যাত। অনেক মিশনারি স্কুল ও মঠ আছে।
কার্শিয়াং, দার্জিলিং জেলা			পাহাড়ি শহর। ন্যারো গেজ ট্রেন গেছে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। প্রচুর চা-বাগান আছে। সাদা অর্কিড আছে। অনেক মিশনারি স্কুল আছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি

শহরের নাম কোন জেলায়	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা			বন্দর শহর ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প।
খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা			আইআইটি শিক্ষাকেন্দ্র ও বড়ো রেলওয়ে স্টেশনের জন্য বিখ্যাত।
আসানসোল, বর্ধমান জেলা			কয়লাখনি অঞ্চলে বেশ বড়ো শহর। তিনটে কলেজ ও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। পাশ দিয়ে বরাকর নদী গেছে। বিখ্যাত ইস্পাত কারখানা আছে। এই শহরে ও কাছাকাছি অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে।

শহরের নাম কোন জেলায়	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া জেলা			ডিগ্রি কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। পোড়ামাটির কাজ, বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত।
দিঘা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা			সমুদ্রের ধারে ছোটো পর্যটন শহর। সমুদ্রে স্নান করার সুযোগ আছে। কাজুবাদাম, শাঁখের কাজ ও মাছের ব্যাবসার জন্য বিখ্যাত।
বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা			রেলের জংশন স্টেশন। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে খুব ভালো পেয়ারা হয়।
শান্তিপুর, নদিয়া জেলা			কলেজ আছে। তাঁতের কাপড় তৈরি হয়। রাসমেলার জন্য বিখ্যাত।

১৮৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখে, পড়ে ও আলোচনা করে ফাঁকা জায়গায় লেখো:

শহরের নাম কোন জেলায়	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
বোলপুর, বীরভূম জেলা			শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। হাতের কাজের জন্য বিখ্যাত।
ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা			হুগলি নদীর মোহনার কাছে শহর। মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র। চিংড়িখালি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পর্যটনকেন্দ্র।
আরামবাগ, হুগলি জেলা			দ্বারকেশ্বর-এর তীরে অবস্থিত শহর। দুটো কলেজ, নতুন রেল স্টেশন হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কৃষি-বাণিজ্যকেন্দ্র।

শহরের নাম কোন জেলায়	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
কাটোয়া, বর্ধমান জেলা			গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কলেজ, রেলস্টেশন আছে। কৃষি-বাণিজ্যকেন্দ্র।
চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান জেলা			রেলের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা আছে।
ডানকুনি, হুগলি জেলা			গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন। কোল কমপ্লেক্স ও দুগ্ধ-সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে।
কল্যাণী নদিয়া জেলা			পরিকল্পিত শহর। মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিল্পকারখানা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি

শহরের নাম কোন জেলায়	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
নবদ্বীপ, নদিয়া জেলা			ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর মিলনস্থলের তীরে অবস্থিত। তাঁতশিল্প, কলেজ ও রেলস্টেশন আছে। চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।
ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা			রেলস্টেশন, রাজবাড়ি, কলেজ, ডিয়ারপার্ক ও সংলগ্ন বনাঞ্চল আছে।
দুর্গাপুর, বর্ধমান জেলা			লৌহ-ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে।
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা			কৃষি ও মৎস্য বাণিজ্যকেন্দ্র। রেলওয়ে স্টেশন আছে। সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত।
তারকেশ্বর, হুগলি জেলা			আলুচাষের অঞ্চলে অবস্থিত শহর। হিমঘর ও উল্লেখযোগ্য কৃষি-বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত।

শহরের আরও কথা

এর মধ্যে অনেকেরই আরও অনেক শহরের কথা মনে পড়ল। তা নিয়ে সবাই বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাও করল। পর দিন জগৎ বলল – আরও কয়েকটা শহরের কথা মনে পড়েছে।

স্যার বললেন – সেই শহর বিষয়ে যা লিখতে চাও নিজেরা লেখো।

ছোটো ছোটো দল করে আবার সবাই আলোচনা করল। পছন্দ মতো ছক করে নিল। কয়েকটা শহরে বিষয়ে লিখল।

বলাবলি করে লেখো

নীচে পছন্দমতো ছক করে নাও। আর যেসব শহরের কথা মনে পড়ছে সেগুলো সম্পর্কে সেই ছকে লেখো :

নানা জায়গার প্রকৃতির নানা সম্পদ

ফুলমণির বাবার বন্ধু মৃগেন মুর্মু। অনেক দূরে থাকেন। বাবার সঙ্গে ফুলমণি সেখানে বেড়াতে গেল। সে আগে কখনও গ্রাম ছেড়ে দূরে যায়নি। এমন দৃশ্যও আগে দেখেনি। রাস্তার পাশে দাঁড়ালে যতদূর দেখা যায় শুধু সবুজ ধানগাছ।

ফুলমণি বাবাকে বলল— আমাদের ওদিকে এমন ধান হয় না কেন?

বাবা বলল— আমাদের লালমাটি। জল দাঁড়ায় না, চাষ হয় না! মাটি যেখানে যেমন। এখানে জমির ঢাল খুব কম। তাই জল দাঁড়ায়। সব জমিতেই ধান হয়।

ফুলমণি হতাশ হলো। তাই তার বাবা আবার বলল— আমাদের ওখানকার মাটিতে পাথর আছে। পাকা বাড়ি করতে লাগে। অন্য জায়গার লোকরাও ওখান থেকেই পাথর আনে।

এসব মাসকয়েক আগের কথা। ফুলমণি চিঠিতে সব লিখেছিল তার বন্ধু জাগরণকে। ওরা এখন কার্শিয়াং-এ গেছে। ওর বাবা সেখানে বদলি হয়ে গেছেন। সে লিখেছে তারা উঁচু পাহাড়েই থাকে। সেখানকার জমি খুব ঢালু। তবু সবুজ চা-বাগানে ছেয়ে আছে।

ফুলমণি স্কুলে গিয়ে বলল জাগরণের কথা। মাসকয়েক আগে মৃগেনকাকার বাড়ি যাওয়ার সময়ে কী দেখেছিল সে কথাও বলল।

সুধন বলল— তোর বাবা তো ঠিকই বলেছেন। আমাদের পাথর আছে। জঙ্গল আছে। কাঠের কত দাম জানিস?

রবিলাল বলল— বাসে করে দু-ঘণ্টা গেলেই কয়লা খনি। ওখান থেকেই সব জায়গায় কয়লা যায়। কয়লা ছাড়া ইট পোড়াতে পারবে?

— স্যার, বিদ্যুৎ তৈরি করতেও তো কয়লা লাগে!

এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন স্যার। হেসে বললেন

— লাগে তো। প্রকৃতির সম্পদ একেক জায়গায় একেক রকম।

বলাবলি করে লেখো:

তোমাদের কাছাকাছি এলাকায় প্রকৃতির কী কী সম্পদ আছে তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো :

তোমাদের কাছাকাছি এলাকার প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী	অন্যান্য সম্পদ কী কী

প্রকৃতি ও মানুষ মিলে তৈরি করে সম্পদ

পরদিন ক্লাসে সম্পদ নিয়ে আবার কথা শুরু হলো। দিদি বললেন--- মানুষের স্বাস্থ্য একটা সম্পদ। তা আছে বলেই পরিশ্রম করতে পারে। বুদ্ধি আর একটা সম্পদ। আর প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে আরও অনেক সম্পদ। সেসব নিয়ে, নিজের স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে,আরও অনেক সম্পদ তৈরিও করছে মানুষ।

ডমরু বলল— যেমন মাটি আর কয়লা দিয়ে করেছে ইট। তা দিয়ে করেছে পাকা বাড়ি।

মৈরাং বলল— একজন মানুষের বুদ্ধি নয় কিন্তু! রান্নার

কথাটা ধর। প্রথমে তো রাঁধতই না। রান্নার জন্য আগুন জ্বালানোর দরকার। অথচ এক সময়ে মানুষ আগুন জ্বালাতে পারত না। তখন কাঁচা খাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তারপরে একসময়ে আগুন জ্বালাতে শিখল। তখন জ্বলন্ত কাঠের আগুনে মাংস ঝলসে খেত। কিন্তু রান্নার জন্য বাসনপত্র চাই। পাত্র না হলে রাঁধবে কীসে? রাখবেই বা কীসে রাঁধা খাবার? খাবেই বা কীভাবে?

বুবি বলল— পরে কেউ বুদ্ধি করে মাটির কড়া করল। তারপর হাঁড়ি। এখন কত কী হয়েছে! স্টিলের বাসন, প্রেসার কুকার, আরো কত কী!

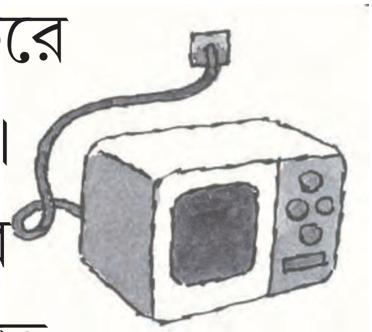

— জানো প্রথম দিকে মানুষ মাটির পাত্রের গায়ে আঁকত। তারপর সেটা পুড়িয়ে শক্ত করে নিত। নানা কিছু আঁকার বিষয় ছিল। মাটি খুঁড়ে তেমন অনেক আঁকা পাত্র পাওয়া গেছে।

মথন বলল— উনুনই কত রকম! আগে মাটিতে গর্ত করে কাঠের উনুন হতো। তারপর আঁচের উনুন। গ্যাসের উনুন। অনেকরকম ইলেকট্রিকের উনুনও হয়েছে।

লক্ষ্মীমণি বলল—কত হাজার বছর ধরে হয়েছে বলত এগুলো। কত মানুষের বুদ্ধি কাজে লেগেছে ভেবে দেখত?

দিদিমণি বললেন—একজন বুদ্ধি করে কিছু করত। আর একজন তা শিখত। তারপর বুদ্ধি করে আর একটু ভালো কিছু করার চেষ্টা করত। এভাবে অনেক মানুষের বুদ্ধি যোগ হয়েছে।

ফুলমণি বলল—এটাই তো মানুষের বড়ো সম্পদ। এভাবে যোগ না হলে একার বুদ্ধিতে বেশি দূর এগোনো যায় না।

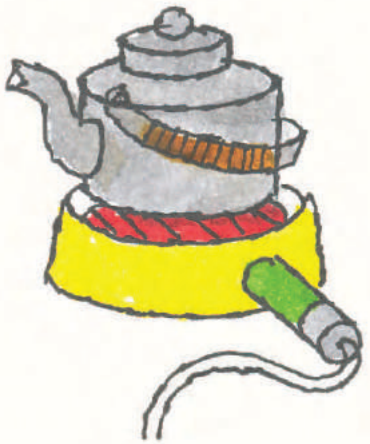

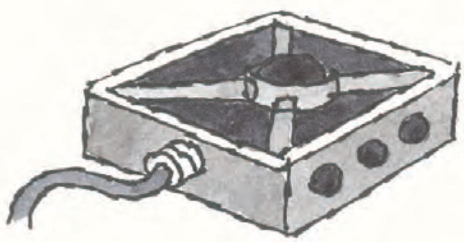

বলাবলি করে লেখো

তুমি যেসব সম্পদ ব্যবহার করেছ তার মধ্যে কী কী অনেক মানুষ মিলে তৈরি করেছে তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

মানুষের তৈরি সম্পদের নাম	ওই সম্পদ কী কী দিয়ে তৈরি	সম্পদটা কী কী কাজে লাগে

লেখা নেই কাগজে, আছে শুধু মগজে

দু-দিন পরে। স্কুলে এসে শ্যামল একটা ঘটনার কথা বলল। খেলতে গিয়ে তার পা কেটে গেছিল। মাঠের পাশে হারুন মিঞার বাড়ি। উনি গাছপাতার ওষুধ জানেন। তাই শ্যামল ছুটে গিয়েছিল তাঁর কাছে। উনি প্রথমে কাটাটা ভালো করে দেখেন। তারপর বাগান থেকে দু-রকম পাতা এনে তার রস লাগিয়ে দেন। কিছুটা ছেঁচা পাতা দিয়ে আঙুলটা মুড়ে দেন। আর একটা পরিষ্কার সাদা কাপড় জড়িয়ে বেঁধে দেন।

পরদিন সকালে শ্যামল দেখে যে আঙুলটায় ব্যথা নেই। কাটাটা দেখা যাচ্ছে। তবে সেটা শুকোনোর মুখে। বিকেলে ঠাকুরদাকে সে ঘটনাটা বলে। ঠাকুরদা বলেন যে হারুনের বাবাও ওই রকম ওষুধের কথা জানতেন। ওষুধ দিয়েছেন তাঁকেও।

সবাই বুঝল যে হারুন মিঞা ওষুধ-গাছগুলো চিনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। তাঁর বাবা হয়তো চিনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। কোনো বইতে ওই গাছের কথা নাও থাকতে পারে।

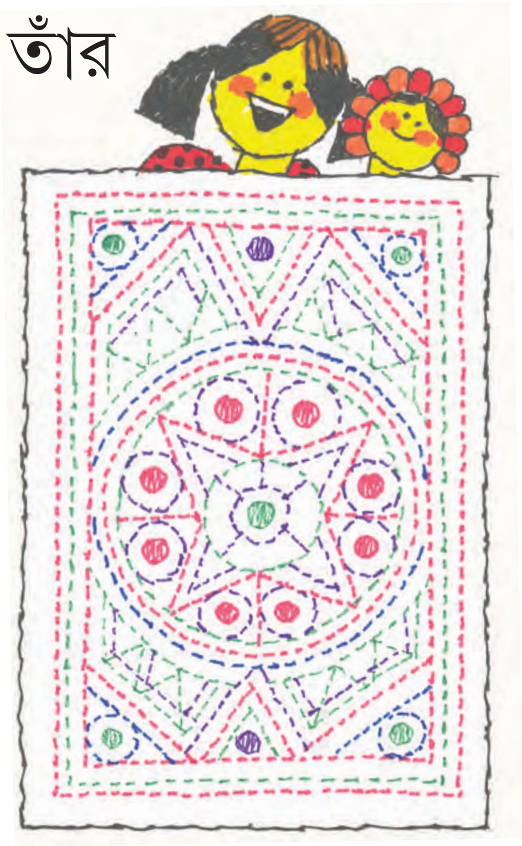

তাই মথন বলল --- আমরা সবাই মিলে ওনার কাছে যাব। গাছটা চিনে নেব।

ইমদাদ বলল — যেতে পারিস। কিন্তু উনি সহজে বলবেন না। আমার দূর সম্পর্কের দাদা হন তো। আমি জানি।

স্যার বললেন — তা হতে পারে। এসব জ্ঞান সাধারণত পারিবারিক সম্পদ। বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছেলেমেয়েরা শেখে।

— না, না। ওঁর ছেলে শহরে ডাক্তারি পড়ছে। তাকেও বলেননি। সে নাকি এসব ব্যাপার জানতেও চায় না।

মথন বলল — তাহলে তো উনি মারা গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

— সেটাই তো চিন্তার বিষয়।

হীরামণি বলল — আমার দিদিমা খুব সুন্দর বড়ি দেয়। খুব ভালো স্বাদ হয়। কিন্তু কীভাবে অত ভালো হয় তা বলে না।

রবিলাল তার ঠাকুরমার নকশাকাটা কাঁথা বানানোর কথা বলল। ফুলমণি বলল তার দাদুর সুন্দর ঝুড়ি বানানোর কথা।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের বা বড়োদের পরিচিত কার এমন জ্ঞান আছে? খোঁজ নিয়ে, আলোচনা করে লেখো:

জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	যাঁর জ্ঞান তাঁর নাম ও পরিচয়	কীভাবে ওই জ্ঞান কাজে লেগেছিল	এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য

জ্ঞান আর উৎসব

নানারকম জ্ঞান নিয়ে কথা হচ্ছিল। মৈরাং বলল— কাকা খুব সুন্দর বাঁশি বাজায়। তোর সামনেই বাজাবে। কিন্তু বাজানো দেখলেই বা বাঁশির সুর শুনলেই শিখতে পারবি না।

ফুলমণি বলল —নাচ-গানও তাই। আমার পিসির মতো নাচতে পারে ক-জন? দেখে তো সবাই!

— সবাই মিলে আমরা যে নাচগান করি সেটাই কি কম সুন্দর নাকি?

ওদের এসব কথা শুনে স্যার খুব খুশি হলেন। বললেন — এই কারণেই সবাই মিলে উৎসব করা দরকার। এমনি করতে করতে কেউ কেউ একেকটা কাজ খুব ভালো শিখবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের কাছাকাছি অঞ্চলে কী কী উৎসব হয় তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

প্রধানত নাচ-গানের উৎসব	প্রধানত অভিনয় ইত্যাদির উৎসব	নানা অঞ্চলের জিনিসের কেনা-বেচা	অন্যান্য উৎসব

স্মরণীয় যাঁরা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৩৮-১৮৯৪)

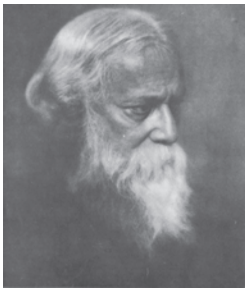
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)

মৈরাং বলল--- ভালো ভালো কাজ করে অনেকেই খুব বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের আমরা চিরদিন মনে রাখি, তাই না?

স্যার বললেন— হ্যাঁ। তাঁদের আমরা সম্মান করি। তাঁদের জন্মদিনে, মৃত্যুদিনে শ্রদ্ধা জানাই।

মথন বলল— যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

— হ্যাঁ, ওঁরা মনীষী। নানারকম লেখা লিখেছেন। দেশের মানুষের ভালোর কথা ভেবেছেন, দেশের জন্য কাজ করেছেন। তাই তো আমরা ওঁদের লেখা পড়ি।

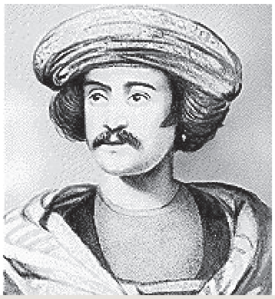
রাজা রামমোহন রায়
(১৭৭২/
মতান্তরে১৭৭৪-১৮৩৩)

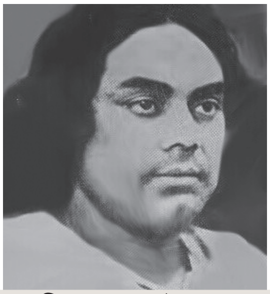
কাজি নজরুল ইসলাম
(১৮৯৯-১৯৭৬)

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও
(১৮০৯-১৮৩১)

মেরি বলল --- দেশের মানুষের ভালো তো আরো অনেকেই করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বেগম রোকেয়া।

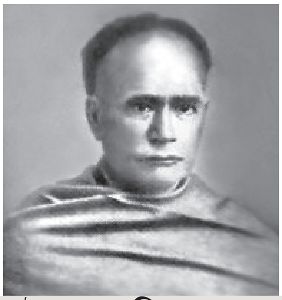
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(১৮২০-১৮৯১)

ভগিনী নিবেদিতা
(১৮৬৭-১৯১১)

--- নিশ্চয়ই। ওঁরা সবাই মনীষী। আগেকার দিনের মানুষের অনেক ভুল ধারণা ছিল। যেমন, বাড়িতে মেয়ে জন্মালে অনেকে দুঃখ পেত। মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শিখতে দিত না। অল্প বয়েসে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিত। কখনও কখনও বর মারা গেলে বউকেও তার সঙ্গে পুড়িয়ে মারত। এসব অন্যায় দেখে রামমোহন, ডিরোজিও,

স্বামী বিবেকানন্দ
(১৮৬৩-১৯০২)

বেগম রোকেয়া
(১৮৮০-১৯৩২)

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
(১৮৫৮-১৯৩৭)

মেঘনাদ সাহা
(১৮৯৩-১৯৫৬)

বিদ্যাসাগর প্রতিবাদ করেন। অনেক লড়াই করে তাঁরা এসব অত্যাচার বন্ধ করেন। দেশের সমস্ত মানুষ যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে তার জন্যও চেষ্টা করেন। বই লেখেন, স্কুল বানান, সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলেন। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের মানুষকে হাতেকলমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন। বলতেন, বইতে মুখ ডুবিয়ে বসে থেকো না। ফুটবল খেলো, তাতে শরীর-মন ভালো হবে। শুধু বই পড়ে কিছু হয় না। ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবনের পরোয়া করেননি। প্লেগরোগীদের সেবা করেছেন। বেগম রোকেয়া মেয়েদের পড়াশোনা শেখানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা সবাই আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ।

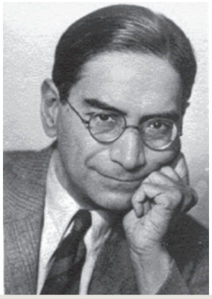
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
(১৮৯৩-১৯৭২)

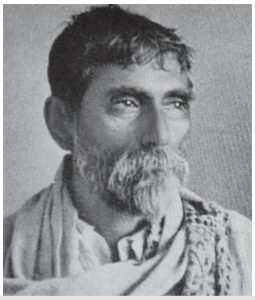
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
(১৮৬১-১৯৪৪)

মৈরাং বলল— আমরা তো বিজ্ঞানী, শিক্ষকদেরও শ্রদ্ধা করি। যেমন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

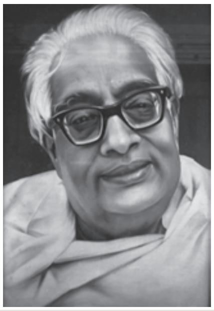

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু
(১৮৯৪-১৯৭৪)

— হ্যাঁ। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বিরাট বিজ্ঞানী। আবার খুব ভালো শিক্ষকও ছিলেন ওঁরা। ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ভালোবাসতেন। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত চন্দ্র মহালনাবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদেরও আমরা শ্রদ্ধা করি।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
(১৮৯৭-   )

পলাশ বলল— আবার গান্ধিজি, নেতাজির জন্মদিনেও তো আমরা পতাকা তুলি। ওঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

— ওঁরা দুজনেই আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক লড়াই করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধি সাধারণ মানুষকে একজোট করেছিলেন। তাদের নিয়ে ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই

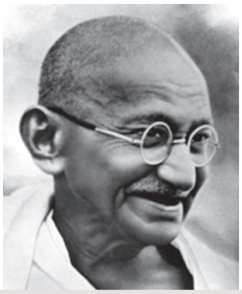

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি
(১৮৬৯-১৯৪৮)

করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ বানিয়েছিলেন। তাইতো ওঁদের আমরা আজও শ্রদ্ধা করি। ওঁদের কাজকর্মের আলোচনা করি। সেসব কাজকর্ম থেকে শিখতে চেষ্টা করি।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) (১৮৭৯-১৯১৫)

লীনা বলল— আরও অনেকেই তো দেশের জন্য লড়াই করেছেন।

— করেছেন তো। অনেক দিন ধরে লড়াই করেই দেশের মানুষ স্বাধীন হয়েছে। অনেক লোক সেই লড়াইতে ছিল। তাদের সবার নাম আমরা জানি না। তোমাদের অনেকেরই বাড়িতে তেমন মানুষ আছেন। আবার অনেকের নাম আমরা জানি। সেই নাম জানা-অজানা সব মানুষই আমাদের শ্রদ্ধার। তবে কেউ কেউ খুবই বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের কাজের জন্য। তাঁদের আমরা সবাই মনে রাখি।

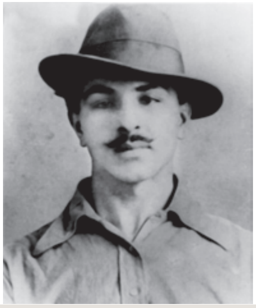

ভগৎ সিং (১৯০৭-১৯৩১)

ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)

সূর্য সেন (মাস্টারদা)
(১৮৯৪-১৯৩৪)

রাবেয়া বলল— যেমন ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং।

—হ্যাঁ। খুব অল্প বয়সে দুই বন্ধু লড়তে গেছিলেন দেশের জন্যে। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি। সুশীল সেন নামে একজন ছাত্র ছিল। ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করার জন্য তাকে বেত মারা হয়। তাকে নিয়ে গান লেখা হয়েছিল। *বেত মেরে তুই মা ভোলাবি, আমরা কী মা-র সেই ছেলে*। এখানে *মা* মানে দেশ। সূর্য সেন ছিলেন মাস্টারমশাই। তিনি ছাত্রছাত্রীদের দেশের কথা বলতেন। দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতেন। দেশের হয়ে কাজ করার জন্য তাদের উৎসাহ দিতেন। নিজেও সরাসরি ইংরেজদের শাসন দূর করার জন্য কাজ করতেন। বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং এঁরা সবাই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। অনেকে লড়তে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁদের দেখে আরো অনেক মানুষ

লড়াই করতে এগিয়ে এসেছেন। এইসব লড়াই একজায়গায় হয়েই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
(১৯১১-১৯৩২)

তোমরা আজ স্বাধীন ভারত দেখছ। এই স্বাধীনতার পিছনে এঁদের সবার চেষ্টা আছে।

রুবি বলল— মেয়েরাও তো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল। মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত।

কল্পনা দত্ত
(১৯১৩-১৯৯৫)

— নিশ্চয়ই। দেশের জন্য লড়াইতে মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেছিলেন। অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন।

মাতঙ্গিনী হাজরা
(১৮৬৯/মতান্তরে ১৮৭০-১৯৪২)

মাতঙ্গিনী হাজরা অসংখ্য মানুষকে একজোট করে লড়াই করেন। ইংরেজরা ভয় দেখিয়েছিল। তবু মাতঙ্গিনী লড়াই ছাড়েননি। গান্ধিজির মতোই মাতঙ্গিনী লড়াই

করেছিলেন। তাই লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে গান্ধিবুড়ি নাম দিয়েছিলেন। এমন আরো অনেক মানুষ আছেন। তোমরা আস্তে আস্তে সবার কথাই জানবে। এঁদের সবার কাজ থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। সেসব শিখতে পারলেই আমরা তাঁদের আসলে শ্রদ্ধা জানাতে পারব।

বলাবলি করে লেখো

আর কোন কোন মানুষজন ভালো কাজ করে খুব বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে বড়োদের কাছে, শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কাছে জানার চেষ্টা করো। নিজেরা আলোচনা করো। তারপর সবার নাম ও কাজের কথা লেখো:

ভালো কাজের জন্য বিখ্যাত মানুষজনের নাম	তাঁদের প্রধান ভালো কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

দিবস পালন: আমাদের উৎসব

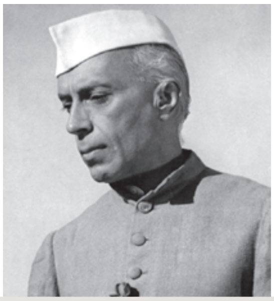

জওহরলাল নেহরু
(১৮৮৯-১৯৬৪)

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর
(১৮৯১-১৯৫৬)

স্কুলে কার কার জন্মদিন পালন হয়? সবাই খোঁজ করতে শুরু করল। উঁচু ক্লাসের একজন বলল — মনীষীদের জন্মদিনের পাশাপাশি আরও নানারকম দিবস পালন হয়! সাধারণতন্ত্র দিবস। স্বাধীনতা দিবস। শিক্ষক দিবস। শিশু দিবস। পরিবেশ দিবস। অরণ্য সপ্তাহ।

হীরামতি বলল —পরিবেশ দিবস পালন করাই উচিত। পরিবেশ ভালো না থাকলে আমরা সুস্থ থাকতে পারব না।

মথন বলল — অরণ্য তো অনেকটাই ধ্বংস হয়েছে। এখন অরণ্যসপ্তাহে কত গাছ লাগাই আমরা। উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণীরা বাঁচবে না। একথা বারবার মনে করানো দরকার। তাই অরণ্য সপ্তাহ পালন।

মৈরাং বলল—মানুষ স্বাধীনতা চায়। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস তো আমরা পালন করবই। আবার সর্বপল্লী